একাদশ অধ্যায়

নিরস্ত্রীকরণ—একটি অমীমাংসিত সমস্যা
[Disarmament—an unsolved Crisis]

১১.১ নিরস্ত্রীকরণ জরুরি কেন ? (Why Disarmament is urgent?)

দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও আতঙ্ক থেকে 'নিরস্ত্রীকরণ' ('Disarmament') শব্দটির সূচনা। বিশ্ব সভ্যতার শুরু থেকেই দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত ও যুদ্ধ একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছিল। আগ্রাসন ও বহিরাক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে রাষ্ট্রগুলি তাদের অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে চলেছিল এবং নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারে মগ্ন হয়েছিল। রাষ্ট্রগুলির সামরিক প্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল নিজ নিজ অস্ত্রভাণ্ডারকে মজবুত ও সমৃদ্ধ করে তোলা। এভাবে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল তার গতি আজও বিরামহীন। কিন্তু এই পরিস্থিতি মানবসভ্যতার কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির সুবাদে মারণাস্ত্র বিশেষত পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র যে ভয়ানক ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে তা জীবন ও সভ্যতাকে নিমেষে ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। এই শঙ্কাবহুল প্রেক্ষিতে নিরস্ত্রীকরণের অবতারণা। নিরস্ত্রীকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মর্গ্যানথো বলেছেন, 'দেশে দেশে অস্ত্রোৎপাদন প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু অথবা সমস্ত প্রকার অস্ত্রসজ্জা কমিয়ে আনা নতুবা বন্ধ করে দেওয়ার নামই হল নিরস্ত্রীকরণ'।[১] নিরস্ত্রীকরণকে কেউ কেউ একটি জরুরি প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন।

অস্ত্রসম্ভার হ্রাস করা ও অস্ত্রসংবরণ নিয়ন্ত্রণে না-আসা অবধি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থাৎ পারমাণবিক সংঘাতের সম্ভাবনা প্রবলভাবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। শান্তিকামী বিশ্ববাসীর তাই ঐকান্তিক কাম্য হল সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ (general and comprehensive disarmament)। অবশ্য নিরস্ত্রীকরণের ধারণা নতুন কিছু নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই ধরনের একাধিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল যদিও তা সেসব দিনে কার্যকর হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে

---

১. 'Disarmament is the reduction or elimination of certain or all armaments for the purpose of ending armament race.'—Hans G. Morgenthau (*Politics Among Nations*), 1960.

Scanned by CamScanner

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা আন্তর্জাতিক কূটনীতি অর্থাৎ বিশ্বরাজনীতিতে তার স্থায়ী জায়গা করে নেয়। পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার উদ্যোগ এসেছিল যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সদ্য গঠিত রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে।

যাইহোক, সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ কাম্য হওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত করা প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় বিশ্বশক্তিসমূহ সীমিত পরিসরে সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা বিশেষ বিশেষ অস্ত্র সংবরণের জন্য নানাবিধ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে চলেছে। লাগামহীন সমরাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা একদিকে যেমন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ওপর চরম আঘাত হানতে সক্রিয়, অপরদিকে তেমনি অনাবশ্যক অর্থব্যয় ঘটাচ্ছে। প্রায় সব দেশই আলাদাভাবে উন্নত পশ্চিমি শক্তিগুলি নিত্যনতুন ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে দেদার অর্থের অপচয় করে চলেছে। এর পরিণতিতে ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন ও জনকল্যাণকর কর্মসূচি। ধনী ও ক্ষমতাবান দেশগুলি যখন কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে সমরাস্ত্র নির্মাণের কাজে; অপরদিকে তখন অনুন্নত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আমজনতার নিত্যসঙ্গী হচ্ছে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্ধাহার, অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা, অপরাধপ্রবণতা, মারী ও মড়ক। একমাত্র সার্বিক নিরস্ত্রীকরণই এই সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। আধুনিক বিশ্বের সুস্থিতি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির সাথে নিরস্ত্রীকরণের নীতি ও প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ১৯৫৩ সালে মন্তব্য করেছিলেন যে নিরন্ন, অশক্ত ও বস্ত্রহীন, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের চরম দুর্দশার মধ্যে রেখে তৈরি হচ্ছে কামান বন্দুক, রণতরী ইত্যাদি।

বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক পুরোপুরি তৈরি না হলে পূর্ণ ও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ কোনো দিনই সম্ভব হবে না। তাই পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পরিবর্তে বাস্তবমুখি আংশিক নিরস্ত্রীকরণের অর্থাৎ সীমিত অর্থে অস্ত্রসংবরণের (partial disarmament) ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় নিরস্ত্রীকরণের মোদ্দা অর্থ হল সাধারণভাবে অস্ত্রসম্ভার হ্রাস ও জৈব-রাসায়নিক অস্ত্রসহ বিবিধ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ধ্বংসসাধন। এই আংশিক নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগে সাফল্যও নেহাৎ কম নয়। পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়তো ঘটেনি কিন্তু এর ওপর নানা ধরনের রাশ টানা হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যদিয়ে। ইতিমধ্যে আন্টার্কটিকা, সমুদ্রের গর্ভদেশ প্রভৃতি অঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারে লাগাম টানা ও যত্রতত্র তার পরীক্ষা রোধেও বিশেষ সাফল্য এসেছে। এই মর্মে স্বাক্ষরিত হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি। বিশ্বব্যাপী জৈব ও রাসায়নিক মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও প্রয়োগ নিষিদ্ধ করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আগে প্রচলিত অস্ত্রসম্ভার হ্রাস তাই আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

Scanned by CamScanner

১১.২ নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ ঃ প্রাথমিক পর্ব (Efforts at Disarmament : Primary Phase)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরস্ত্রীকরণের প্রকৃত উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সমরাস্ত্র হ্রাসের প্রয়াসের প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক হেগ সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৭-এর হেগ সম্মেলনেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে লিগ অব নেশনস বা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্যদিয়ে বিবাদ-বিরোধ দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার যে উদ্যোগ লিগ গ্রহণ করেছিল সেই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রসংবরণ। লিগের বাইরে এই বিষয়ে একাধিক চুক্তি হলেও আলোচ্য পর্বে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল লিগের নেতৃত্বে। বলা যেতে পারে ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত লিগ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। লিগের চুক্তিপত্রে লিগের পরিষদ (Council)-এর ওপর অস্ত্রসম্ভার হ্রাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চুক্তিপত্রের ৮ সংখ্যক ধারায় (article 8) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে 'জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের' সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লিগভুক্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলি সমরসজ্জা হ্রাস করবে। এখানে আরও বলা হল যে লিগের পরিষদের অনুমোদন বিনা কোনো সদস্যরাষ্ট্র অধিক অস্ত্রসম্ভার উৎপাদন নতুবা সংগ্রহ করতে পারবে না। স্থির হল সদস্যরাষ্ট্রসমূহ একে অপরকে অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতি দশ বছর অন্তর বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হবে।

লিগের নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ধারাবাহিক উদ্যোগগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) ১৯২০ সালে লিগ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশন (Permanent Advisory Commission) গঠন করে। এর ঠিক এক বছর আগে ১৯১৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সেন্ট জারমেন-এন-লেতে 'Control of Traffic in Arms' বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তির সঙ্গে লিগের নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত শর্তসমূহ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশনের পাশাপাশি লিগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি অস্থায়ী মিশ্র কমিশন (Temporary Mixed Commission) স্থাপন করেছিল যেটির সদস্যসংখ্যা ছিল কুড়ি জন বিশেষজ্ঞ।

অস্থায়ী মিশ্র কমিশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি হল স্থলবাহিনী সীমিতকরণ যেটি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। দ্বিতীয় সুপারিশটি ছিল

Scanned by CamScanner

লিগভুক্ত সব রাষ্ট্রের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর আনুপাতিক শক্তির হার নির্ণয় করা। সেটিও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সদিচ্ছার অভাবে বাতিল হয়ে যায়। তৃতীয় প্রস্তাবটিতে নিরস্ত্রীকরণের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি খসড়া চুক্তি সম্পাদনের ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে এবং অন্যদিকে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নগুলি এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। চতুর্থ ও শেষ প্রস্তাবে অস্থায়ী কমিশনের ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘ জেনেভা প্রোটোকল (Geneva Protocol) রচনা করে যা লিগের অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। বলাবাহুল্য, লিগের সদস্যরাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার অভাবে ১৯২৪ সালে নিরস্ত্রীকরণের ভারপ্রাপ্ত পূর্বোক্ত অস্থায়ী মিশ্র কমিশনটির অকালমৃত্যু ঘটে।

(২) নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে লিগের পরবর্তী উদ্যোগ ছিল ১৯২৫ সালে একটি প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) গঠন। এই প্রস্তুতি কমিশনে সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানি ও আমেরিকা আমন্ত্রিত হয়েছিল। এর প্রায় পরে পরেই ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত প্রতিনিধি লিৎভিনভ সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যদিও অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরোধিতায় তা বাতিল বলে গণ্য হয়। প্রস্তুতি কমিশন পরবর্তী সময়ে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আয়োজন শুরু করে যেটি ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(৩) নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল নিঃসন্দেহে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (World Disarmament Congress)। এই সম্মেলন বসেছিল ১৯৩২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। মোট ৬১টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। একাধিক কারণে এহেন মহতী উদ্যোগও শেষঅবধি ব্যর্থ হয়েছিল। এই সম্মেলনে মোট তেত্রিশটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল ফ্রান্সের উত্থাপিত আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী গঠনের প্রস্তাব, ব্রিটেনের পেশ করা সেনাসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব, আমেরিকা উত্থাপিত $\frac{১}{৩}$ অংশ সমরাস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব, রাশিয়া দ্বারা উত্থাপিত পর্যায়ক্রমিক অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব, গ্রিসের তোলা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রস্তাব ইত্যাদি। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবের দরুন উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহের ভবিষ্যত ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই কমিশন ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও এর সাফল্যের খতিয়ান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই সম্মেলন তথা নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগের পতনের কারণগুলি ছিল একাধারে বিচিত্র ও বহুমুখী। ১৯৩১-এ জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ; প্রায় একই সময়ে বিশ্বব্যাপী মন্দাজনিত অর্থনৈতিক সংকট এবং সর্বোপরি, ১৯৩৩ সালে হিটলারের উত্থান সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ১৯৩২ সালে জার্মানি অপরাপর শক্তির সহিত সমানাধিকারের দাবি জানিয়েছিল

Scanned by CamScanner

এবং সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে জার্মানি প্রথমে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ও পরে জাতিসংঘ ছেড়ে চলে যায়। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ওপর এই ঘটনার বেশ কিছুটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়েছিল। অধ্যাপক ল্যাংসাম বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য লিগকে দায়ী করার পাশাপাশি জানিয়েছেন, ইটালি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মতো দেশগুলি লিগের গুরুত্ব সম্পর্কে অপরিমেয় অবজ্ঞা পোষণ করে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।[২] আপাতভাবে এই মহতী উদ্যোগের অকার্যকারিতার জন্য লিগ দায়ী হলেও এই বিষয়ে বিশ্বশক্তিগুলিরও কম দায়িত্ব ছিল না। বিশ্বের কোনো বৃহৎ শক্তি চায়নি নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগ সফল হোক। বিশ্ব জনমতও এই বিষয়ে প্রায় উদাসীন ছিল। এর পরিণতিতে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যাইহোক, ব্যর্থতা সত্ত্বেও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বেশ কয়েকটি মৌলিক নীতিকে তুলে ধরেছিল। অন্যভাবে বললে ঐ সম্মেলনের সাফল্যগুলি ছিল লক্ষ করার মতো : (ক) যুদ্ধে বিষাক্ত তথা মারণ গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিল; (খ) প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ওপর রাশ টানা হল; (গ) সমরাস্ত্রের সংকোচনের দায়িত্ব এখন থেকে স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ওপর আরোপিত হল এবং (ঘ) বলা হল সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার সমরাস্ত্র নির্মাণের ওপর তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। এখানে গৃহীত নীতিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হল যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার উপযুক্ত সমাধান হতে পারে।

লিগের বাইরে নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস (Disarmament beyond League of Nations)

লিগ বা জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের বাইরেও বিশ্বকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চলেছিল এবং সেই ধরনের বেশ কয়েকটি উদ্যোগ অনেকটাই সাফল্যের মুখ দেখেছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তাজনিত উদ্যোগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল এবং সেই পর্বে তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সে পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, এমনকি চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার মতো ছোটো ছোটো দেশগুলির সঙ্গে ছোটো পরিসরে আঁতাত গড়ে তোলে। ১৯১৯ সালের পর থেকে ফ্রান্স উক্ত দেশগুলির সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৯২৫-এ এই ধারায় নতুন সংযোজন ছিল লোকার্নো চুক্তি (Locarno Pact)। ঐ চুক্তিতে ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, ইটালি ও বেলজিয়াম

---

২. W. C. Langsam, *The World Since 1919*, Delhi, 1981, p. 88.

Scanned by CamScanner

স্বাক্ষর করেছিল। এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমঝোতা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে কিয়দংশে সফল হয়েছিল। ১৯২৮-এ স্বাক্ষরিত এরূপ অপর একটি চুক্তি ছিল প্যারিসের চুক্তি বা কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি। বলাবাহুল্য, এইসব দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলি নিরস্ত্রীকরণের জমি তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। একইভাবে বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি যেমন তুরস্ক, গ্রিস, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং পরবর্তীকালে বুলগেরিয়া পারস্পরিক চুক্তির মারফৎ 'বলকান আঁতাত' অর্থাৎ বলকান লিগ গঠন করেছিল। এই আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত টিকে ছিল। অনুরূপ চুক্তিজোটের নজির হল ১৯৩৭ সালে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি যেটি 'সাদাবাদের চুক্তি' (Treaty of Saadabad) নামে পরিচিত ছিল। এই ধরনের আঞ্চলিক চুক্তির একটি ছিল সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের মতো স্কেন্ডেনেভীয় দেশিগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিও (লাটভিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া প্রভৃতি) প্রায় সমগোত্রের একটি আঞ্চলিক মৈত্রীব্যবস্থার শরিক হয়েছিল।

লিগ বহির্ভূত নিরস্ত্রীকরণের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল আমেরিকার উদ্যোগে ১৯২১-এ অনুষ্ঠিত দূরপ্রাচ্য সম্পর্কিত ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference)। এই সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল ছিল নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক পঞ্চশক্তি চুক্তি (Five Power Treaty)। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মধ্যদিয়ে ঘোষণা করে দূর প্রাচ্যে নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাশ টানা হবে। বিদ্যমান নৌশক্তির ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার প্রশ্নে উপরোক্ত শক্তিগুলির নির্ধারিত হার ছিল যথাক্রমে—৫ ঃ ৫ ঃ ৩ ঃ ১.৭৫ ঃ ১.৭৫। অবশ্য এই চুক্তিতে সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার ও বিমানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ মতৈক্য তৈরি হয়নি।

১৯২৫ সালে ঐতিহাসিক জেনেভা সম্মেলনে (Convention for the Supervisions of International Trade in Arms, Ammunation and Implements of War) গৃহীত প্রস্তাবে রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস বা মারণগ্যাস এবং জীবাণু যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এর দুবছর পর ঐ একই স্থানে নৌশক্তি হ্রাসের প্রয়োজনে একটি নৌ-সম্মেলনের আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু এই চুক্তিও পরবর্তীকালে ১৯৩০ ও ১৯৩৫ সালে লন্ডনে আহূত আরো দুটি সম উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নৌ-সম্মেলন কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। একপ্রকার ১৯৩৭ সাল থেকেই নিরস্ত্রীকরণের প্রায় সব ধরনের উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর পরে পরেই সূচিত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাসমর।

Scanned by CamScanner

১১.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে নিরস্ত্রীকরণ ঃ রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা (Disarmament after Second World War : Role of UNO)

নিরস্ত্রীকরণ যেমন একপক্ষীয় (unilateral), দ্বিপক্ষীয় (bilateral) ও বহুপক্ষীয় (multilateral) হতে পারে তেমনি প্রয়োগের নিরিখে নিরস্ত্রীকরণ স্থানীয় বা আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী হতে পারে। এই শেষোক্ত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের আন্তরিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের হাত ধরে। পূর্বতন লিগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে অধিক সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রসংঘের সনদের (UN Charter) ২৬ সংখ্যক ধারায় নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের মিলিটারি স্টাফ কমিটিকে এ-কাজে সহায়তা করার কথাও বলা হয়। নিরস্ত্রীকরণের আবশ্যকতা তুলে ধরে ঘোষণা করা হল যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখার জন্য এহেন উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি ("In order to promote the establishment of international peace and security with the least diversion for armaments of human and economic resources of the world.....the Security Council shall be responsible...."). নিরাপত্তা পরিষদের পাশাপাশি সাধারণ সভার ওপরেও নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব কিছুটা চাপানো হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের সনদের ১১ (১) সংখ্যক ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "The General Assembly may consider....the principles governing disarmament and regulation of armaments". কার্যক্ষেত্রে অবশ্য উপরোক্ত বিষয়ে সাধারণ সভার ভূমিকা ও ক্ষমতা ছিল নিতান্তই সীমিত।

১৯৪৫ সালের ৩ অক্টোবর মস্কোতে রাষ্ট্রসংঘের সাথে সাধারণ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন। এই ঘোষণার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যাজেন মন্তব্য করেছেন, 'যুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে (উপরোক্ত) চতুঃশক্তি একটি কার্যকরী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।'[৩] ঐ বছরের ১৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও কানাডা ঘোষণা করেছিল যে তারা রাষ্ট্রসংঘের অপরাপর সদস্যরাষ্ট্রগুলির সাথে পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক বিশদ তথ্য আদানপ্রদান করতে প্রস্তুত। সোভিয়েত ইউনিয়নও এই ঘোষণাকে অনুমোদন করেছিল। সে উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একযোগে সাধারণ সভার কাছে দাবি জানিয়েছিল যে UN Atomic Energy Commission অবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন।

---

৩. C. D. Hazen, *Modern Europe Since 1789*, p. 649, 1995 edn.

Scanned by CamScanner

যদিও ক্যালভোকোরেসি বলেছেন ১৯৫০-এর শেষভাগের আগে পর্যন্ত যুদ্ধ-পরবর্তী নিরস্ত্রীকরণের ইতিহাস ছিল ব্যর্থতায় ভরা[৪] তবুও এই পর্বের অস্ত্রসংকোচনের সবচেয়ে আশাপ্রদ পদক্ষেপ ছিল ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি আণবিক শক্তি কমিশন (Atomic Energy Commission) গঠন। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলি মিলে মোট এগারোটি সদস্যরাষ্ট্র ও কানাডা এই আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ছিল। এই কমিশন আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা পরিষদের নিকট উপস্থাপন করবে স্থির হয়। অবশ্য জুন মাসের আগে এই কমিশন কাজ শুরু করতে পারেনি। আণবিক শক্তি কমিশন বেশ কয়েকটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল। এগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

১. কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণভাবে আণবিক শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।
২. রাষ্ট্রীয় অস্ত্রভাণ্ডার থেকে আণবিক অস্ত্র ও ঐ প্রকার গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
৩. গৃহীত প্রস্তাবগুলি সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা।

বারুচ পরিকল্পনা (Baaruch Plan)

১৯৪৬ সালে একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা কূটনীতিক বার্নাড বারুচ-কে আণবিক শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কমিশনের নিকট বারুচ নিরস্ত্রীকরণের যে বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেন তা 'বারুচ পরিকল্পনা' (Baaruch Plan) নামে পরিচিত হয়। ঐ পরিকল্পনায় বলা হল : (ক) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে নিরাপত্তা পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা—International Atomic Development Authority গঠন করবে। (খ) যুদ্ধের প্রয়োজনে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া অধিকার বর্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের ওপর। (গ) নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্য দেশের আণবিক ও অন্যান্য অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র পরীক্ষা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে। (ঘ) নিরাপত্তা পরিষদের সভায় আণবিক নিয়মবিধি লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ এলে তাতে ভেটো প্রয়োগ করা যাবে না। (ঙ) নিরাপত্তা পরিষদ দেশে দেশে তার পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা কর্মসূচি সমাধা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার নষ্ট করে ফেলবে।

---

৪. 'The history of post war disarmament discussion is one of futility until the end of fifties.' Calvocoressi, *op. cit.*

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রসংঘের আণবিক শক্তি কমিশন উপরোক্ত 'বারুচ পরিকল্পনা'কে স্বীকৃতি দিলেও সোভিয়েত রাশিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই পরিকল্পনার বিরোধিতায় নেমেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধি গ্রোমিকো অতঃপর বিকল্প একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে অবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস করতে নতুবা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এ-কাজ তার দৃষ্টিতে ছিল 'first and indispensable step' যা বিশ্ববাসীর আস্থা ফেরাতে জরুরি ছিল। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন এরূপ কোনো চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নও বারুচ পরিকল্পনা বর্জন করার কথা ঘোষণা করে। এরূপ সোভিয়েত-বিরোধিতার কারণে বারুচ পরিকল্পনা শেষঅবধি বাতিল বলে গণ্য হয়। ১৯৫২-তে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স নতুন করে সেই পরিকল্পনা পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া পরীক্ষামূলকভাবে আণবিক বোমা বানাতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক, সামরিক তথা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটালো। পুঁজিবাদী শিবিরের নেতৃত্বদাতা আমেরিকার একচেটিয়া পারমাণবিক আধিপত্য এর ফলে বিনষ্ট হল। ১৯৫০-এর অক্টোবর ও ১৯৫১-এর নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রাষ্ট্রসংঘের কাছে আণবিক বোমা ধ্বংস করা ও বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ ঘটানোর প্রস্তাব দেন। তিনি একই সাথে United Nations Atomic Energy Commission ও Commission for Conventional Armaments-এ নামক সংস্থাদুটির একীকরণের সুপারিশ করেন। ১৯৫২-র জানুয়ারি মাসে উক্ত কমিশনদুটির বিলুপ্তি ঘটে এবং রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন (United Nations Disarmament Commission)-কে অনুমোদন দান করে। বলা হল, ঐ কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। ১৯৫২-৫৩ সালে কমিশন একাধিক সভা ডাকলেও এর সাফল্য তেমন কিছু ছিল না। অবশ্য নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারপরেও অব্যাহত ছিল।

আইজেনহাওয়ার পরিকল্পনা (Eisenhower Plan)

কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে এক অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ১৯৫৩-র ১৬ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ওপর তাঁর চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'The United States was ready to join with all nations in devoting a substantial percentage of the savings achieved by disarmament for a fund for world aid and reconstruction'। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি পারমাণবিক সামগ্রী ও কৃৎকৌশল যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য একটি প্রস্তাব আনেন। তিনি

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় অতঃপর নিরস্ত্রীকরণের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবটি ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেদের মধ্যে সামরিক ঘাঁটিগুলির আলোকচিত্রের ব্লুপ্রিন্ট বিনিময় করবে। তিনি রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তর্জাতিক শক্তি কমিশন (International Atomic Energy Commission) প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পরের বছর ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও কানাডা থেকে পাঁচজন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে এই বিষয়ে জেনেভাতে একটি শীর্ষ সম্মেলন আহূত হয়েছিল। এই সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শেষঅবধি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করতে এবং সমরাস্ত্রের বোঝা হ্রাস করতে নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য এবং এই উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।

১৯৫৬-তে রাষ্ট্রসংঘের সভায় প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার 'শান্তির জন্য আণবিক শক্তি' (Atoms for Peace) ব্যবহার বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন সচিব জন ফস্টার ডালেস মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের সূত্রধরে একটি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তিসংস্থা (International Atomic Energy Agency) গঠনের ওপর জোর দেন। ঐ বছরের ২০ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত প্রতিনিধি আন্দ্রে গ্রোমিকো নিরস্ত্রীকরণের পাল্টা প্রস্তাব দেন। এর চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ পূর্বতন আইজেনহাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। অবশ্য এর পরেও নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস চালু ছিল। ১৯৫৮ সালের জেনেভা সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের বাইরে নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৮-র ৩১ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে সে এককভাবে ভবিষ্যতে ছ'মাসের জন্যে পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ রাখবে। ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর স্তালিন-পরবর্তী সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চেভ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আগামী চার বছরের মধ্যে সব রাষ্ট্র নিজেদের নিরস্ত্রীকরণ ঘটাবে।

১১.৪ ষাটের দশকে নিরস্ত্রীকরণের অগ্রগতি ঃ পরমাণু অস্ত্র নিরোধক চুক্তি (Disarmament in 60s : Nuclear Test Ban Treaty)

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে নিরপেক্ষ ও নির্জোট দেশসমূহের লাগাতার দাবির সুবাদে রাষ্ট্রসংঘের আণবিক কমিশন যেমন পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল তেমনি নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াসও গতি লাভ করেছিল। ১৯৬০ সালে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে জেনেভাতে রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহূত হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে সমগ্র বিষয়টি দেখভালের জন্য একটি দশ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরাষ্ট্রগুলি

Scanned by CamScanner

ছিল যথাক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, ইটালি, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও রুমানিয়া। এই কমিটির সুপারিশগুলি পেশ হওয়ার আগেই মে মাসে দুই বৃহৎ পরাশক্তি, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া প্যারিসে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। প্যারিসের মঞ্চে দুই পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র এই প্রশ্নে একমত হয়েছিল যে (১) নিরস্ত্রীকরণ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য, (২) উভয় দেশই পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার রাশ টানবে, (৩) রাসায়নিক ও ঐ ধরনের জনবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে, (৪) সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করবে ইত্যাদি। ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত নির্জোট দেশগুলির সম্মেলন-মঞ্চ থেকেও উভয় মহাশক্তিধর রাষ্ট্রকে পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষা কর্মসূচি বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়েছিল।

১৯৬১-তেই রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ১৮টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে আরও দুটি দেশ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ কমিটির ঐ ২০টি সদস্যরাষ্ট্র ছিল যথাক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, কানাডা, ব্রাজিল, বার্মা, ইথিওপিয়া, ভারত, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, সুইডেন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, বহির্মোঙ্গলিয়া ও জাপান। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের আগস্টে আরো ছ'টি দেশ উক্ত কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল—আর্জেন্টিনা, হল্যান্ড, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, মরক্কো এবং পাকিস্তান। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপরোক্ত দেশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিল ঘোষিত জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এই উদ্যোগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়নি। এর কিছুদিনের মধ্যেই সে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। যাইহোক, উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ১৯৬৩ সালের ৫ আগস্ট মস্কোতে একটি আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিরোধক চুক্তি (Partial Nuclear Test Ban Treaty) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে সমুদ্রগর্ভে, মহাকাশে ও অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি হল। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই এই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিকে সেদিন স্বাগত জানিয়েছিল। হ্যাজেন-এর ভাষায়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এটি ছিল প্রথম চুক্তি এবং ভারত প্রথম এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল'।[৫] মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই চুক্তির অসীম গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'It will not reduce our need for arms and allies of programmes for

৫. 'It was the first agreement between the East and the West and India was the first to sign it.'—Hazen, *op. cit.*, p. 652.

Scanned by CamScanner

assistance to others. But it is an important first step—a step towards peace—a step towards reason, a step away from war.' তিনি যতই এই চুক্তিকে শান্তির অভিমুখে, যুক্তির সপক্ষে অথবা যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি সময়োচিত পদক্ষেপ বলুন না কেন, ফ্রান্স ও চীনের মতো দু'একটি দেশ এই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কমিউনিস্ট চীন শুধুমাত্র এই নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীন-বিরোধী ও কমিউনিস্ট দেশসমূহের স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রজাল রচনার অভিযোগ এনেছিল। আসলে চীন ইতিমধ্যে আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণকৌশল করায়ত্ত করেছিল এবং এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা চালাতে চেয়েছিল।

১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ঐ চুক্তিতে বলা হয়েছিল মহাকাশে চাঁদ ও অন্য কোনো গ্রহে ধ্বংসাত্মক কোনোরূপ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে না এবং মহাকাশে দুটি রাষ্ট্রের কেউই একচেটিয়া সার্বভৌমত্ব দাবি করবে না। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৬৭ সালে মহাকাশে উপগ্রহ প্রেরণ ও মহাকাশকে যথাযথ ব্যবহার করার নীতি গৃহীত হয়েছিল। এর পরের বছর ১৯৬৮ সালের ১২ জুন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার উদ্যোগে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিটির পোশাকি নাম ছিল 'পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ নিরোধক চুক্তি' (Nuclear Non-proliferation Treaty)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন নিজে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে সদস্যদের এটিতে স্বাক্ষর করার অনুরোধ জানান। এই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি প্রকৃতিতে কিছুটা বৈষম্যমূলক ছিল। বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহ এরূপ পরিস্থিতিতে সমান্তরালভাবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেল—পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ ও অ-পারমাণবিক রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রগুলি সম্মত হল যে তারা কোনো অ-পরামাণবিক রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র অথবা পারমাণবিক বোমা নির্মাণের কৃৎকৌশল কোনো অবস্থাতেই প্রদান করবে না। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ অধিকার থাকল ঐধরনের অস্ত্রনির্মাণের। অবশ্য বলা হল পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি অ-পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকৌশল চাইলে হস্তান্তর করতে পারবে। যাইহোক, আগের মতোই ফ্রান্স ও চীন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। ঐ দুটি দেশ তাদের মতো করে পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছিল। চীনের বিদেশমন্ত্রী চেন ই এই চুক্তিকে একটি 'পুরোদস্তুর বৈষম্যমূলক চুক্তি' ('out and out unequal treaty') বলে সমালোচনা করেছিলেন। ভারতও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে শেষঅবধি সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

Scanned by CamScanner

১১.৫ দাঁতাতের আবহে নিরস্ত্রীকরণের অগ্রগতি (Extension of Disarmament in the background of D'etente)

ষাটের দশকে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের অবসানের সূত্র ধরে যে দাঁতাতের সূচনা হয়েছিল নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে রিচার্ড নিক্সন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলে দাঁতাতের কূটনীতিতে উল্লেখযোগ্য গতিসঞ্চার হয়েছিল এবং যার পরিণতিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৬৯ সালেই আমেরিকার উদ্যোগে কৌশলগত অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় রাশটানার বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব পায়। ঐ সময় থেকে SALT অর্থাৎ Strategic Arms Limitation Talks বা কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ সংক্রান্ত আলোচনা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে নিবিড় মতবিনিময় শুরু হয়। এর পরিণতিতে নিরস্ত্রীকরণের ইতিহাসে একটি সফল পর্ব সংযোজিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত ব্যর্থতা পরিশেষে পরাজয় দাঁতাত এবং নিরস্ত্রীকরণের ওপর গভীর ও সদর্থক প্রভাব ফেলেছিল। দাঁতাতজনিত নিরস্ত্রীকরণের এই অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ডে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তাঁর উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভ।

সল্ট-১ বা কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি-১ (Strategic Arms Limitation Treaty—SALT-I)

১৯৭২ সালের ২৬ মে মস্কোতে তদানীন্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়ে যে শীর্ষবৈঠকে মিলিত হন সেখানে দুই পরাশক্তির মধ্যে প্রথম স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তি SALT-I নামে পরিচিত ছিল। এখানে দুটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং সে দুটি ছিল মূলত ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত। দুই শক্তি এই সমঝোতায় এসেছিল যে তারা অত্যাধুনিক মারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ না করলেও সেগুলির উৎপাদন কমিয়ে আনবে। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমিনির্ভর ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM অর্থাৎ Inter-Continental Ballistic Missile) এবং সমুদ্রনির্ভর ক্ষেপণাস্ত্রের (SLBM অর্থাৎ Submarine-launched Ballistic Missile) সংখ্যা দুটি মিলিয়ে যথাক্রমে ১৭১০ ও ২৩৫০-এ কমিয়ে আনবে। চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে বলা হল দুপক্ষই ABM (Anti-Ballistic Missile) বা ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ দেশের রাজধানীর মতো যে-কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

এই SALT-I চুক্তির মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর এবং স্বভাবতই ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে এটি বাতিল হয়ে যাবে স্থির হল। যাইহোক, এই চুক্তিতে উভয় রাষ্ট্রনেতাই নিরাপত্তার স্বার্থে পরমাণু অস্ত্রসহ ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। একে অপরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই অস্ত্র উৎপাদনের ও স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তা খোলা রেখেছিল। এই সীমিত সাফল্য সত্ত্বেও SALT-I ছিল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে একটি অগ্রগতিস্বরূপ। 'Balance of Terror' বা 'আতঙ্কের ভারসাম্য' বজায় থাকার পাশাপাশি এই চুক্তিতে বিরামহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় রাশ টানা হয়েছিল। এই চুক্তিকে তাই কেউ কেউ 'সামরিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ' ও 'পারমাণবিক অস্ত্রের পরিবার নিয়ন্ত্রণ' বলে আখ্যাত করেছেন। যেভাবেই হোক নিরস্ত্রীকরণ এর দরুন একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।

হেলসিঙ্কি সম্মেলন ও সল্ট-২ চুক্তি (Helsinki Conference and SALT-II)

১৯৭৪ সালের নভেম্বরে নিক্সনের উত্তরসূরি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জিরাল্ড ফোর্ড সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজেনেভের সঙ্গে ভ্লাদিভস্তক-এ একটি শীর্ষবৈঠকে মিলিত হন। দুই প্রধান নেতা এই সময় শুধুমাত্র তাদের মজুত পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণের কাজের মধ্যেই থেমে থাকেননি, তাঁরা সেই অস্ত্র কমিয়ে আনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভ্লাদিভস্তক চুক্তি (Vladivostok Accord) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই বৈঠকে তাঁরা ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ এই দশ বছরব্যাপী একটি চুক্তিতে অস্ত্রহ্রাসে সম্মত হয়েছিলেন। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত অনুযায়ী দুই পরাশক্তির ক্ষেপণাস্ত্র রাখার সর্বোচ্চসীমা ২৪০০-তে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। একই সাথে মস্কো ও ওয়াশিংটন ভূগর্ভে ১৫০ কিলোটনের বেশি ক্ষমতাশালী পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

পরের বছর ১৯৭৫ সালের ৩০ জুলাই হেলসিঙ্কি-তে ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রশ্নে একটি শিখর সম্মেলনের সূচনা হয়। মোট ৩৬টি দেশ এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। ১ আগস্ট শেষঅবধি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ আন্তরিকভাবে অনুধাবন করেছিল যে ক্রমাগত সামরিক সংঘাত ও সমরাস্ত্রের নগ্ন-প্রতিযোগিতা বিশ্বনিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করছে যার অবসান অবশ্যকাম্য। এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড, সোভিয়েত প্রধান ব্রেজনেভ প্রমুখ। সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিবৃন্দ একটি বিশেষ সনদে স্বাক্ষর দান করেছিল। সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা কার্যত, 'recognised the interest of all of them in efforts aimed at lessening military confrontation and promoting

Scanned by CamScanner

disarmament which are designed to complement political detente in Europe and to strengthen their security.'[৬]

দ্বিতীয় সল্ট চুক্তি বা কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি-২ স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের জুন মাসে ভিয়েনায়। ইতিপূর্বে ১৯৭৭ সালের ১৮ মে জেনেভা শহরেই সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন আহূত হয়েছিল। যাইহোক, ১৯৭৯-তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভ একটি শীর্ষবৈঠকে মিলিত হন এবং এর পরিণতিতে SALT-II চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কার্টার এই চুক্তিকে শান্তির জয় বলে ঘোষণা করেন এবং ব্রেজনেভও জানান যে মানুষের অত্যাবশ্যক তথা পবিত্র অধিকার বাঁচার অধিকারকে তাঁরা নিরাপদে রক্ষা করেছেন। পরবর্তী সময়ে নবনির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন এই চুক্তির নবীকরণ ঘটাননি। তিনি মনে করতেন যে এই দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং মার্কিন স্বার্থকে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়েছে। এই মানসিকতাই নতুন করে সমরসজ্জা ঘটিয়েছিল।

নক্ষত্র যুদ্ধের প্রকল্প (Star War Project)

১৯৮২ সালে প্রেসিডেন্ট রেগন নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে এক নতুন পর্যায়ের আলোচনার প্রস্তাব দেন যা START (Strategic Arms Reduction Talks) নামে সুপরিচিত ছিল। এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল Intermediate Range Nuclear Force চুক্তি। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৮৩-র ২৩ নভেম্বরে ঐ আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দেয় কারণ ইতিমধ্যে NATO ইউরোপের দেশে দেশে মার্কিনি প্রযুক্তির মাঝারি পাল্লার ক্রুজ ও পের্সিং-২ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে চলেছিল। ১৯৮৩-তে সোভিয়েত-মার্কিন বিরোধ চরমে উঠেছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগনের তাকলাগানো নক্ষত্র যুদ্ধ (Star War) কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে। বিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকের শেষদিকে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা CIA জানিয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়েছে। উন্নততর সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র SS-18, SS-19 ও SS-20 পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে—এই অজুহাতে রেগন ১৯৮৩-র ২৩ মার্চ মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কয়েক হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে তাঁর গৃহীত নতুন ও অভিনব প্রতিরক্ষা কর্মসূচির নাম ছিল SDI (Strategic Defence Initiative) অর্থাৎ মোদ্দা কথায়, তারকা যুদ্ধের কর্মসূচি। এই প্রকল্পের দরুন মহাকাশেও অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রসার

---

৬. C. D. Hazen, *op. cit.*, p. 655.

Scanned by CamScanner

ঘটেছিল। সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রকে মহাকাশে ধ্বংস করে ফেলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই SDI কর্মসূচির তীব্র নিন্দা করেছিল। এর পাশাপাশি বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন এই মার্কিন নক্ষত্র যুদ্ধের কর্মসূচির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। তাদের প্রধান অভিযোগ ছিল এর ফলে সমরাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা নতুন করে বৃদ্ধি পাবে, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং সর্বোপরি, মহাকাশে পরমাণু শক্তির প্রদর্শন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাওয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনা নতুন করে শুরু হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ও তার উৎসাহী প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫-র শেষে।

১১.৬ সোভিয়েত প্রধান গরবাচভ ও নিরস্ত্রীকরণের প্রসার (Soviet Chief Gorbachev and the extension of Disarmament)

১৯৮৫ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মিখাইল গরবাচভের নিযুক্তি পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের ইতিহাসে একটি সফল পর্বের সূচনা করেছিল। ঐ বছর সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনা নতুন উদ্যমে শুরু হল। বলা হয়ে থাকে, 'The leaders of the two delegations were the soul of courtesy but they admitted that the talks would be extremely difficult and protracted'[৭] ১৯৮৫-র ১৯-২০ নভেম্বর জেনেভায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগন ও সোভিয়েত প্রধান গরবাচভের মধ্যে একটি শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনার শেষে দুই রাষ্ট্রনেতা একটি যৌথ বিবৃতিতে জানিয়ে দেন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দুপক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা আবার একটি বৈঠকে মিলিত হবেন। গরবাচভ আমেরিকা ভ্রমণের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন। এই সামগ্রিক উদ্যোগটির পিছনে ছিলেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী সোভিয়েত রাষ্ট্রের শেষ কর্ণধার বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মিখাইল গরবাচভ।

যাইহোক, দুই শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে রেইকজাভিক শীর্ষবৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকেও তেমন দর্শনীয় কিছু সাফল্য আসেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে বিশ্বজনমত দুই পরাশক্তির ওপর নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছিল। ১৯৮৫ সালে দিল্লিতে আহূত ছয়টি নির্জোট দেশের সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সভাপতি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি প্রধানত মস্কো ও ওয়াশিংটনের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিরস্ত্রীকরণের আবেদন

---

৭. Hazen, *op. cit.*, p. 656.

Scanned by CamScanner

রাখেন। যাইহোক, এক সময় ১৯৮৭ সালে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে INF (Intermediate-Range Nuclear Force) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে ভূমিভিত্তিক মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহের উৎপাদন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পাশাপাশি ঐ ধরনের সমরাস্ত্র উৎপাদনের ঘাঁটিগুলিও পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত রেগন ও গরবাচভ নিয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে দুই পরাশক্তির মধ্যে বিপজ্জনক সামরিক ক্রিয়াকলাপ স্থগিত সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থার বিলোপসাধন হলে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার করা হলে পারমাণবিক তথা সামরিক উত্তেজনাও বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক START-I (Strategic Arms Limitation Treaty) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির কালে আমেরিকার নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন জর্জ বুশ। এই চুক্তি দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রকে সর্বাধিক ১৬০০টি Strategic Nuclear Delivery Vehicles এবং ৬০০০ যুদ্ধ বোমা (Warhead) রাখবার অনুমতি দিয়েছিল। ১৯৯১-এর ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন সম্পূর্ণ হয়। ঐ সমাজতন্ত্রী পরাশক্তির পতনের পর নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটির গুরুত্ব বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল। প্রজাতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বরিস ইয়েলেৎসিন ১৯৯২-র জানুয়ারিতে একটি দশ দফা নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন যেমন পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণুঅস্ত্রসহ জনবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ধ্বংস করা, দূরপাল্লার আণবিক বোমা নষ্ট করে ফেলা এবং ৬০০টির মতো সমুদ্র ও ভূতলে অবস্থিত আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র অপসারিত করা ইত্যাদি। প্রায় একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফেও স্বেচ্ছামূলক নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট বুশ B-2 বোমারু বিমানের উৎপাদন, টোমাহক মিসাইল সহ মারাত্মক কিছু ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট বুশ ও রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রধান ইয়েলৎসিনের মধ্যে START-II চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে উভয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের অর্ধেকের বেশি ধ্বংস করতে রাজি হয়। একই সময়ে আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ভারতসহ বিশ্বের প্রায় শতাধিক রাষ্ট্র রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

১১.৭ নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগে সাম্প্রতিক সংকট (Present crisis in Disarmament)

বলাবাহুল্য, ঠান্ডা লড়াই-উত্তর কালেও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত কর্মসূচি ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা অব্যাহত থাকে। START-II-র পর START-III চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল ২০০২-এর মে

Scanned by CamScanner

মাসে। এই আলোচনার সূচনা হয়েছিল ১৯৯৯-এর আগস্টে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের উদ্যোগে। আগের মতো এই চুক্তিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্রের মজুতভাণ্ডার হ্রাস করা। অবশ্য ২০০১ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে জর্জ বুশের ক্ষমতারোহণ নিরস্ত্রীকরণের গতিতে বিশেষ বাধা দান করেছিল। তিনি জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা (National Missile Defence—NMD)-র কর্মসূচি গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক স্তরে অস্থিরতা নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রেগনের নজিরবিহীন নক্ষত্র যুদ্ধের (Star War) একরকম পরবর্তী সংস্করণ ছিল NMD কর্মসূচি যা রাশিয়ার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। অবশ্য এসবের পাশপাশি নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত আলোচনাও চালু ছিল। ২০০২ সালের ২৪ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া মস্কোতে ঐ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিটির পোশাকি নাম ছিল SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) অর্থাৎ কৌশলগত আক্রমণমুখী ক্ষেপণাস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি। এটি 'মস্কো চুক্তি' নামেও পরিচিত ছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দুটি দেশের ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয় ১৭০০ থেকে ২০০০। কিন্তু জর্জ বুশের ধারাবাহিক আগ্রাসনের নীতি তথা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের নামে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ কর্মসূচি এবং পাশাপাশি উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশগুলিকে আক্রমণের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন নতুন করে সমরসজ্জার সূচনা করে এবং নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াসকে একপ্রকার স্তব্ধ করে দেয়। উপসাগরীয় যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচি নতুন করে শুরু হয় এবং এক-মেরু বিশ্বে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অস্থিরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ অসহায় পরিস্থিতি এই ২০০৮ সালেও প্রায় একইরকম রয়ে গেছে।

১১.৮ সর্বাত্মক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি ও ভারত (CTBT and India)

ইতিপূর্বে ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের উদ্যোগে সম্পাদিত NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty) অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ নিরোধক চুক্তির কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের আবহে ঐ চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসার রোধ করা। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার রাজনৈতিক কমিটির ১২৪টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ভোটাধিক্যে NPT গৃহীত হয়েছিল। শুরুতেই ৭০টি সদস্যরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও কমিউনিস্ট চীন, ফ্রান্স ও অন্যান্যদের সঙ্গে ভারতও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। ঐ সমস্ত দেশগুলির অভিযোগ ছিল NPT পুরোপুরি বৈষম্যমূলক এবং এই চুক্তি সম্পাদনের গূঢ় লক্ষ্য ছিল আণবিক শক্তিকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমায়িত রাখা। পরমাণু ক্লাবের বাইরের কোনো রাষ্ট্র যাতে পরমাণুশক্তির অধিকারী হতে

Scanned by CamScanner

না পারে তা নিশ্চিত করাও ঐ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল। চীন NPT-কে একটি চূড়ান্ত বৈষম্যনির্ভর চুক্তি ('out and out unequal treaty') বলে উল্লেখ করেছিল। ক্যালভোকোরেসি-র ভাষায় 'বৃহৎ শক্তিগুলির কেউই চায়নি তাদের পরিমণ্ডলের বাইরে অন্য কোনো দেশের সমরাস্ত্রভাণ্ডার পারমাণবিক অস্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হোক।' '....Neither of them wanted to see nuclear weapons in any other states' armouries'.[৮] এই পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ নিরোধক চুক্তির অপর একটি ত্রুটি ছিল যে এখানে পরমাণু বিজ্ঞান ও পারমাণবিক প্রযুক্তিকেও পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছিল যা যথার্থ ও যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না।

যাইহোক, দীর্ঘমেয়াদি এই চুক্তিটির মেয়াদ নতুন করে বাড়ানো হবে কিনা তা বিবেচনার জন্য ১৯৯৫ সালের এপ্রিলের শেষদিকে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ ঐ সম্মেলনে কানাডার প্রতিনিধি চুক্তিটির মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য করার প্রস্তাব দেন। বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি ঐ প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করলেও জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ এবং আরব রাষ্ট্রগুলি ঐ উদ্যোগের বিরোধিতা করে। এদের মূল বক্তব্য ছিল চুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্ট করা হলে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিরই লাভ হবে; তারা এই বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার লাভ করবে। কিন্তু ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও NPT-র মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল বাড়ানো হয়। এ-ব্যাপারে ১৯৯৯-এর ১১ মে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

NPT-এর মেয়াদ বিষয়ক বিতর্কের মাঝেই ১৯৯৬ সালে ঘোষিত হয়েছিল যে অচিরেই পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সর্বাত্মক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি বা Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) স্বাক্ষরিত হবে। সেই মতো N-5 নামে পরিচিত পাঁচটি প্রধান দেশ আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন ঐ চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করে। বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রগুলিকেও এই চুক্তির আওতায় আনার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রবল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য ঐ জাতীয় মারণাস্ত্র উৎপাদনের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যেও CTBT স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, ঐ বিশেষ চুক্তি (CTBT)-তে ভারত স্বাক্ষর করেনি যদিও নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে ভারত তার শান্তিকামী উজ্জ্বল ভূমিকা বরাবর পালন করে এসেছে। ভারত বুঝেছিল যে ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে তাকে স্থায়ীভাবে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। সে সংশ্লিষ্ট চুক্তি থেকে দূরে ছিল কারণ ভারত সরকার স্বাধীনভাবে

৮. P. Calvocoressi, *op. cit.*, p. 36.

Scanned by CamScanner

পরমাণু শক্তি নিয়ে গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ১৯৭৪ সালের ১৮ মে ভারত রাজস্থানের পোখরানে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায় ও প্রার্থিত সাফল্য অর্জন করে। ভারত সরকার অতঃপর জানিয়েছিল যে ভারত পরমাণু শক্তিকে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ প্রয়োজনেই ব্যবহার করবে। এর পরবর্তীকালে ১৯৯৮-এর মে'র ১১-১৩ তারিখে ভারত রাজস্থানের মরুগর্ভে দুটি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। অতঃপর ভারত পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমত, সি.টি.বি.টি.-তে স্বাক্ষর না-করা এবং দ্বিতীয়ত, পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর কারণে ভারত অনতিবিলম্বে বৃহৎ শক্তিগুলির নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। অবশ্য বর্তমানে আমেরিকা, জাপান ও অন্যান্য দেশ ভারত প্রসঙ্গে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ক্রমশ তা শিথিল হয়ে আসছে। একপক্ষ থেকে এরূপ প্রচারও চালানো হচ্ছে যে সি.টি.বি.টি.-তে স্বাক্ষর করার বিনিময়ে ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ প্রদান করা যেতে পারে। প্রায় ১৯০টির মতো দেশ এ-পর্যন্ত ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ২০০৭-এ মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. জোট সরকার প্রবলতর মার্কিনি চাপের মুখে পড়ে ঐ নিউক ডিল-এ স্বাক্ষর করতে উদ্যোগী হয়। কংগ্রেস সরকারের জোটসঙ্গী বামপন্থী দলগুলি সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকিও দিতে থাকে। বামেদের মতে ঐ চুক্তি মেনে নেওয়ার অর্থ হল দেশের সার্বভৌমত্বকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ বুশ প্রশাসন একপ্রকার একতরফাভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে ভারতকে সংশ্লিষ্ট হাইড অ্যাক্ট মানতেই হবে। বুশ প্রশাসনের দুনম্বর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কন্ডোলিজা রাইস বলেছিলেন যে পরমাণু জ্বালানি সরবরাহকারী গোষ্ঠী (NSG)-র সঙ্গে ভারতের সমঝোতা হাইড অ্যাক্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই আমেরিকা তা মেনে নেবে। হাইড অ্যাক্ট মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হয়েছিল অসামরিক পরমাণু ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মতি দিতে। বামপন্থীরা শুরু থেকেই বলে আসছে যে এই আইন অনুযায়ী, ভারত নতুন করে পরমাণু পরীক্ষা করলে মার্কিন সহযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কার্যত, সংশ্লিষ্ট অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি (নিউক ডিল) করার অর্থই হল পরমাণু পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার বিসর্জন দেওয়া। এই চুক্তির বিরোধীদের মতে CTBT রীতিমতো বৈষম্যমূলক; ভারতের স্বাধিকার তথা সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। তাঁরা জানান, ঐ চুক্তি স্বাক্ষরের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে তবেই এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যথার্থ কাজ হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ী সরকারের আমলে ভারত পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণের পরে পরেই আন্তর্জাতিক স্তরে পারমাণবিক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি জানিয়েছিল। আমেরিকাসহ সমগ্র পশ্চিমি দুনিয়া ও প্রতিবেশী চীন এই

Scanned by CamScanner

ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। আমেরিকা কার্যত, চমকিত হয়েছিল কারণ তার শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা CIA এর কোনো আগাম খবর দিতে পারেনি। অতঃপর একদিকে যেমন ভারতের ওপর অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে অপরদিকে তেমনি ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই প্রসঙ্গে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। NDA বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অনেকে সেদিন এই প্রশ্ন তুলেছিল যে ভারতের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে এই জাতীয় ব্যয়বহুল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল কিনা। বলা হয়েছিল এর পরিণতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক ক্ষেত্রে অহেতুক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অনেকেই এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলে ছিলেন। তাঁদের মতে পরমাণু শক্তি তথা ক্ষমতা যাচাই করার জন্যেও এটি জরুরি ছিল। তাঁরা আরও বলেছেন, CTBT-তে স্বাক্ষর করেও অনেকে পরমাণু পরীক্ষা চালিয়ে গেছে। ভারতের এই কাজের মধ্যেও গর্হিত দোষের কিছু ছিল না। আর অবরোধের উত্তরে বলা যায় ভারতের চেয়েও প্রধান অবরোধকারী দেশ আমেরিকার ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। একসময় আমেরিকা তার বণিককুলের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ২০০০ সালেই ভারতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। সর্বোপরি, পাকিস্তানের ক্রমাগত যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে ভারতের পারমাণবিক শক্তি প্রদর্শন করা জরুরি ছিল।

ইতিমধ্যে বিতর্কিত ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরমাণু চুক্তি বাস্তবায়িত করার প্রশ্নে রীতিমতো অনমনীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর দৃঢ় মনোভাবের পরিণতিতে বাম দলগুলি শেষ অবধি ২০০৮-এর জুলাই-এর গোড়ায় UPA সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকার অবশ্য সমাজবাদী পার্টি ও অপরাপর ছোটো দলগুলির সাহায্য নিয়ে ২২ জুলাই-এর আস্থাভোটে জয়লাভ করে। পরিণতিতে মনমোহন সিং প্রশাসন আপাতত টিকে যায়। অন্যদিকে, ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার ডিল (123 Act)-এর আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করে ইউ.পি.এ.-র চেয়ারপার্সন শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধি ইতিপূর্বে জানিয়ে দেন যে ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থেই ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি অপরিহার্য। তিনি আরো বলেন যে, আগামী প্রজন্ম এই চুক্তির গুরুত্ব ঠিকই বুঝবে। তাঁর মতে দেশে বিদ্যুৎ-এর চাহিদা মেটাতেও উন্নত পারমাণবিক প্রযুক্তি ও পারমাণবিক জ্বালানির প্রয়োজন বিশেষ জরুরি। এই আন্তর্জাতিক চুক্তি সেই প্রযুক্তি ও জ্বালানি পেতে বিশেষ সাহায্য করবে। তিনি ঘোষণা করেন, 'Let me make it categorical here. There is no question of compromising the nation's secrurity and our nuclear programme....' অবশ্য সরকারপক্ষের এই সাফাইয়ের সত্যতা নিয়ে বামপন্থীসহ অপরাপর বিরোধী দলগুলি প্রতিনিয়ত প্রশ্ন তুলে চলেছে। এই

Scanned by CamScanner

পরমাণু চুক্তিতে স্বাক্ষর করা তাদের কাছে ভারতের সার্বভৌমত্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বন্ধক রাখার সামিল। চুক্তির সমালোচকদের মতে দেশের নিরাপত্তা এর দরুন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে, স্বাধীন মতো পারমাণবিক গবেষণার অধিকার বিশেষভাবে এর ফলে সংকুচিত হবে।

যাইহোক, IAEA (International Atomic Energy Agency) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তিসংস্থার সঙ্গে ভারতের রক্ষাকবচ চুক্তি (Safeguard pact) চূড়ান্ত রূপ পাবে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আই. এ. ই. এ.-র বোর্ড অফ গভর্নরসের বৈঠকে। সেখান থেকেই পরমাণু জ্বালানি সরবরাহকারী গোষ্ঠী বা NSG-র কাছে দিল্লি আনুষ্ঠানিক আবেদন পাঠিয়ে দেবে। ইতিপূর্বেই অবশ্য NSG-র অনুমোদন পাওয়ার প্রক্রিয়া জোর কদমে ভারত শুরু করে দিয়েছে। এই বছরের শেষ নাগাদ ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত হওয়ার বিষয়টি এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অতীতে ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই তারিখে ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু সমঝোতা বিষয়ক আলোচনা সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল। সেই গটনার ত্রি-বর্ষ পূর্তি হল সম্প্রতি। ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা-র কাছে ভারত তার রক্ষাকবচ চুক্তি ও আমেরিকার সঙ্গে তার পরমাণু চুক্তির নানা বিষয় ব্যাখ্যা করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এমতাবস্থায় রক্ষার অপেক্ষা রাখে না যে আন্তর্জাতিক পরমাণু চুক্তিতে ভারতের স্বাক্ষরদান এবং স্বীকৃত পরমাণু ক্লাবে ভারতের অন্তর্ভুক্তি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। NSG-র ছাড়পত্র পাওয়ার পাশাপাশি ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি কোনোরূপ সংশোধনী ছাড়াই গত ২০০৮-এর অক্টোবর মাসে মার্কিন সেনেটে পাশ হয়ে গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে সাক্ষরিত হয়েছে বহু বিতর্কিত ও বহুচর্চিত দ্বিপাক্ষিক পরমাণু চুক্তি। এই চুক্তি ভবিষ্যত ভারতকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তা সময়ই বলবে। যদিও নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে এই ঘটনার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।

Scanned by CamScanner